পথের ধুলোয় যাবে উড়ে

ডালিয়া নিলুফার

এবার বই মেলায় প্রথম যেদিন যাই, সেদিন কি কারণে মনটা বিক্ষিপ্ত ছিল। বোধহয় একটু মনমরাও ছিলাম। সন্ধেবেলা। অথচ লোকজন দেখে মেলার ভিড় বলে মনে হয়না। শাহবাগের গন জাগরণের ঢেউ তরঙ্গায়িত হতে হতে এই পর্যন্ত এসেছে। আজ আসার আগে সেই বিশাল জনসমুদ্র ডিঙ্গিয়ে এসেছি। একাত্মতা কি জিনিষ বোঝা গেছে। প্রতিবাদের সঙ্গে আবেগ মিশে গেলে কি হয়, তাও। দেখি, আকাশ, মাটি, ভাষা, কারুরই আলাদা না। তবু কাজ কারবার দেখে বোঝা মুশকিল হয় এরা সব এক দেশের মানুষ। সময়মত সব ভাগ-ভাগ হয়ে যায়। কি বলব, ক্ষুদ্র স্বার্থচিন্তা আমাদের মধ্যে বরাবরই ছিল। জাতি হিসেবে আমরা কখনো নিঃশত্রুও ছিলাম না। আর এখনতো দেশ দেখলে মনে হবে- বিভীষণের সংসার। নেতৃত্বের অহংকার শেষ পর্যন্ত আমাদের কোন দিকে নিয়ে যাবে কে জানে! আশঙ্কার কথা থাক।

দেখলাম স্টলগুলির সামনে ছোট ছোট ভিড়। লোকজন বই দেখে। নাড়েচাড়ে। গাল-গপ্প করে। কেনেনা তেমন। সব চেয়ে বেশী যা করে, দাড়িয়ে দাড়িয়ে মোবাইলে ছবি তোলে। যে যেমন পারে। মানুষের যে কতরকম নেশা!

স্টলের সামনে দাড়িয়ে কথা বলছি। সঙ্গে আমার পুরোনো বন্ধুবান্ধব। বহু দিন যাদের সঙ্গে দেখা হয়নি। কথাও না। মেলার এই এক সুবিধে। এমন এমন মানুষের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, যাদের এ জীবনে দেখার কোন আশাই থাকেনা। এরপর কথা শুরু হলে যা হয়, পুরনো চালের মত কেবল ভাতে বাড়তে থাকে। হচ্ছিল ও তাই। এর মধ্যে খেয়াল করিনি কখন আমার কাঁধে ঝোলানো ব্যাগের ভিতর হাত ঢুকিয়ে দিয়েছে বারো বছরের এক ছেলে। কোন এক আশ্চর্য ক্ষমতায় সে আমার পার্সটাও প্রায় বের করে ফেলেছে। আর ঠিক তক্ষুনি কি মনে করে জানিনা, আমিও ব্যাগের মধ্যে হাত রাখতে যাচ্ছিলাম। অস্পষ্ট হলেও টের পেলাম আমার হাত ঘেঁষে আলগোছে বেরিয়ে গেল তার হাত। আর সঙ্গে সঙ্গেই সে ছায়ার মত সরে গেল আমার পাশ থেকে। দেখলাম ব্যাগের চেন খোলা। আমার পার্স গলা বাড়িয়ে দিয়েছে, দুনিয়া দেখবে বলে। সর্বনাশ তেমন কিছুই হচ্ছিলোনা। তবু ব্যাপার বুঝে কিছুক্ষণ কেমন যেন হতভম্বের মত লাগল। এমনিতে জিনিষ পত্র সামলে রাখার ব্যাপারে আমি যে খুব বেশী সাবধানী, তা না। বলতে গেলে অন্য মনস্কই থাকি। ফলে কত কিছু যে হারিয়েছি এ পর্যন্ত! বুঝে এবং দু'এক সময় না বুঝেও। যাহোক, চেন আটকাতে আটকাতে পিছন থেকে তাকে এক নজর দেখলাম। ততক্ষণে সে ঢুকে গেছে সামনের স্টলে। শ্যামলা রং। ছোট-খাট পাতলা শরীর। পরনে নীল চেক শার্ট। এটুকুই। তাড়াহুড়ো গলায় জিজ্ঞেস করছে- ''অঙ্ক বই আছে? অঙ্ক বই?''। দোকানী কি বলল না বলল, শুনল না। তার আগেই চট করে স্টল ছেড়ে বেরিয়ে গেল। আর ভিড়ের মধ্যে মিশে যেয়ে সোজা হাটতে শুরু করল। পিছনে তাকালো না। তাকালে দেখত, আমিও কেমন নেশাগ্রস্থের মত হাঁটছি তার পিছন পিছন। একটু দূরে যেয়েই সে হাটা থামাল। দেখলাম পকেটে হাত রেখে বড় করে একটা নিঃশ্বাস নিল। আমি আস্তে করে তার কাছে যেয়ে দাঁড়ালাম। সোজা চোখের দিকে তাকিয়ে- ধমক না, রাগ না, কেবল হাতটা ধরে জিজ্ঞেস করলাম -''এই কাজ কেন করলে?''। সে একটুও কাঁপল না। দৌড়ও দিলনা। শুধু হঠাৎ উড়ে আসা ঢিলের মত প্রশ্নটা শুনে হতবিহ্বল বড় বড় চোখ তুলে নিরুত্তর তাকিয়ে থাকল আমার দিকে। গরীব ঘরের নিরীহ চেহারা। ফ্যাকাসে মুখ। মুখে সামান্য অপ্রস্তুত হাসি। তাকিয়ে দেখছি। ভদ্র কাপড় চোপড় পরা কেউ একজন এসে যে তার হাত ধরতে পারে এ যেন তার জ্ঞানের মধ্যেই ছিলনা। এই মুখের দিকে তাকিয়ে এর চেয়ে বেশী কি আবিষ্কার করা যায়?

অপরিণত বয়সের এই ছেলেটিকে কোন মতে আমার পকেটমার বলতে ইচ্ছে করছে না। আমার নিস্তেজ মুখ দেখে তার কতখানি আক্রমণাত্মক মনে হয়েছিল জানিনা। কি অনুমান করেছিল তাও বুঝিনি। তবে আর কিছু শোনার আগেই সে বলে বসল- ''আমি আপনের কিছু নেই নাই। এই যে দেখেন।'' বলেই তাড়াতাড়ি পকেটে

হাত ঢুকিয়ে সব বের করে দেখাতে লাগল। কি প্রশ্নের কি উত্তর! আমি যে টাকার খোঁজ করতে তার পিছন পিছন আসিনি, সেই কথাটাই শুনল না। যেন জানাই ছিল কেন এসেছি। যাহোক, আমি আর কি বুঝব? এতক্ষণ সন্দেহ ছিল। এই মাত্র নিশ্চিত হয়ে গেল। দেখলাম তার দুই হাত ভরে টাকা। দুই পকেটে যা অগোছালো ভাবে রেখেছিল। বিশ, পঞ্চাশ, একশ। এমনকি পাঁচশ। এই বয়সের ছেলেদের পকেটে এত টাকা থাকে কে জানত!

আমার কাছে কোন দিনই বলার মত টাকা থাকেনা। আর যটুক থাকে তার সব ধরে দিলেও কিছু যায় আসেনা। থাকার মধ্যে জরুরী কিছু কাগজ পত্র থাকে, এই যা। নিলে সত্যি সত্যি বিপদে পড়ব। জিজ্ঞেস করলাম- ‘‘কাগজ পত্র কিছু নিয়েছ?’’ সে মাথা নাড়ল। অর্থাৎ নেয়নি। কথাও ঠিক। তার পকেট যে রকম দেখলাম তাতে শুধু টাকাই গুজে রাখা যায়। জরুরী কাগজ রাখার মত জায়গা সেখানে একেবারেই নাই।

ভাবছিলাম অন্য কথা। এরকম বয়সে ছেলেদের মনের মধ্যে থাকে ভরা সাহস, বেসামাল কৌতূহল। বুকভাঙ্গা অভিমানের সাথে মিশে থাকে ছেলেমানুষি। আর সারল্যের মত আশ্চর্য সব সম্পদ। সে যে তার কতখানি খুইয়ে ফেলেছে কে জানে! তার সেই প্রাণ প্রাচুর্য কেড়ে নিয়ে সেখানে লোভের এই বিষ যে কোন কেউটে ঢুকিয়ে দিল! উপার্জনের এই অসাধু পথ তাকে যে কোন শত্রু চিনিয়ে দিল! অভাবী মানুষের ছেলে বলেই কি ঘটল এই সর্বনাশ? নাকি দেশটা গরীব বলেই অন্ধকার জগতের থাকে অমন ভাঙ্গা কপাট? ভদ্রলোকের কাছে যা নেহাতই ’খারাপ লাইন’? কি তার নেপথ্য কাহিনী কে জানে! এই রুক্ষ কৈশোর কাটাতে কাটাতে তার তারুণ্য এবং যৌবন কতখানি কর্কশ হবে, অনুমান করে মন ভারী হয়ে গেল।

সত্যি কথা কি, আমি এর আগে কোনদিন পকেটমার দেখিনি। অন্ততঃ সামনা-সামনি না। দু’একবার যা দেখেছি, তাও সিনেমায়। সামনা-সামনি এই জন্য দেখা হয় নি তার কারণ যতবার দেখতে গেছি, ততবার তার ঐ এক শরীরের উপর অন্ততঃ বিশ পঁচিশ জন মানুষকে দেখেছি উপুড় হয়ে মারতে। দু’একজন তো হাসতে হাসতেই মারত। যেন খোলা রাস্তার উপর এর চেয়ে বড় তামাশা আর হয়ই না। সেই ভয়ানক ক্ষিপ্ত ভীমরুলের মত মানুষদের প্রচণ্ড কিল, ঘুষি, লাথি, সরিয়ে কখনও তার মুখটা দেখার কথা ভাবতেই পারতাম না। তাদের সেই উল্লাসের কথা মনে পড়লে এখনও মন খারাপ হয়। যেন মারেনি। উপযুক্ত বিচার করে দিয়েছে। সেই শাস্তি যে কখনও কখনও পাওনার চেয়ে দু’চার গুন বেশী হয়ে যেত, সেই খেয়ালই থাকত না কারো। বুঝিনা, এ কেমন দেশ, যেখানে পাঁচ টাকা নিলে পাঁচশ টাকার মার খেতে হয়?

আমার সেই ভয়টাই হচ্ছিল। যে দেশে মানুষ ন্যায় অন্যায় না বুঝেই মারে, ক্ষতবিক্ষত করে, রক্তাক্ত করে- সে দেশে এই অন্যায় টুকু দেখলে তারা যে কি করত! এইটুকু শরীর যা এখনও সেই শক্ত হাতের মার খাওয়ার উপযুক্তই হয়নি, তাকে হাতে পেলে তারা যে কোন উল্লাসে মাততো, কোন রকম হিতাহিত জ্ঞান থাকত কিনা, ভেবে আমার গলা শুকিয়ে গেল।

সামান্য দু’একটা উপদেশে মানুষের কোন উপকার হয় কিনা আমি জানিনা। আর অযাচিত উপদেশ শুনে সে যে তার জীবন পাল্টে ফেলবে না, তাও বুঝি। তার পরেও কি মনে করে শুধু বললাম ‘‘এই কাজ আর কোনদিন কোর না।’’ এর বেশী কিছু বলা সম্ভব হলো না। আমার অক্ষম ক্ষোভের কথা নতুন করে কি বলব? তাকে পথে ফেরানোর সাধ্যও আমার নাই।

সংসারে তাকে বোঝানোর মত আর কে আছে জানিনা। তবু অনুরোধ হোক, উপদেশ হোক অথবা কিছুই না হোক, এই অবুঝ কিশোরের মাথার উপর হাত রেখে আমি যে সামান্য কথাটা বলতে পেরেছিলাম-এইটুকুই সান্তনা। যদিও আমার কথা শুনে নিশ্চল দাড়িয়ে থাকা দিশেহারা এই কিশোরকে অকুল অন্ধকারে ফেলে রেখেই আমি চলে এসেছিলাম।